Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

ঔপনিবেশিক বাঁকুড়ার জনস্বাস্থ্যঃ প্রসঙ্গ কুষ্ঠ

সুকান্ত মজুমদার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
গভর্মেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ মানবাজার-২ , পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপঃ সামাজিক ইতিহাস রচনার বিষয় হিসাবে, সাম্প্রতিক কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে,[1] যা নিয়ে দেশ ও বিদেশের প্রচুর গবেষক, গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে, প্রথম গবেষণার সূচনা হয়েছিল ইয়োরোপে। আর আমাদের এদেশেও রোগ-ব্যাধি নিয়ে গবেষণার সূচনা করেছিলেন পশ্চিমী গবেষকরাই, যাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন ডেভিড আর্নল্ড। সেই সূত্র ধরেই পশ্চিমবাংলার পাশাপাশি ভারতবর্ষের অনান্য জায়গার ঐতিহাসিকদের কাছে রোগ-ব্যাধি-মহামারী, রোগী কিংবা ঔষধ ও নিরাময় পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সামাজিক ইতিহাস রচনার একটি নুতন ক্ষেত্র হিসাবে সংযোজিত হয়েছে।[2] যদিও জেলা ভিত্তিক রোগ, মহামারী, চিকিৎস্যা পদ্ধতি ও পরিকাঠামো বিষয়ক, ইতিহাস গবেষণার সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। এই প্রবন্ধে মূলত আলোচনা করা হয়েছে ঔপনিবেশিক বাকুঁড়ার জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে, তৎকালীন কুষ্ঠরোগের প্রভাব ও প্রকোপ এবং কুষ্ঠরোগীর সামাজিক অবস্থা, কুষ্ঠরোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সরকারী কর্তিপক্ষ, মিশনারী, ডিসট্রিকবোর্ড, ইউনিয়নবোর্ড প্রভৃতির অবদান এবং কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা নিয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের মনোভাব কেমন ছিল তা নিয়ে।

সূচক শব্দঃ ঔপনিবেশিক, কুষ্ঠ, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, ব্রিটিশ, মিশনারী।

বর্তমান বাঁকুড়া জেলা ছিল ভবিষ্য পুরাণে বর্নিত রাঢ়ীখন্ড জনপদের অংশ।[3] ১৮৬৩ খ্রীঃ কর্নেল গ্যাসট্রেল লিখেছেন, পঞ্চাশ বছর আগেও বাঁকুড়া জেলা ছিল গভীর অরন্যাবৃত।[4] বনাঞ্চলের আধিক্যের কারনে এক সময় এই অঞ্চল জঙ্গল মহল নামে পরিচিত ছিল। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদনীপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে ১৮০৫ খ্রীঃ এই জঙ্গল মহল জেলা তৈরী হয়েছিল। পরবর্তী কালে প্রশাসনিক প্রয়োজনীতার কারনে ও পাশাপাশি ভূমিজনদের বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৮৩৩ খ্রীঃ জঙ্গল মহলকে টুকরো করে মানভূম জেলা তৈরী হয়েছিল। প্রশাসনিক তাগিদকে সামনে রেখে, বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ১৮৭৯ খ্রীঃ বর্তমান বাঁকুড়া জেলা তার রূপ লাভ করেছিল এবং ১৮৮১ সালের ১৪ এপ্রিল বাঁকুড়া পূর্নাঙ্গ জেলার মর্যাদা লাভ করেছিল।[5] W.W. Hunter, বাঁকুড়াকে চিহ্নিত করেছিলেন এই ভাবে, "As a connecting link between the plains of Bengal on the East and the

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

mountains and highlands of Chutia Nagpur on the West".[6] ভৌগোলিক দিক থেকে বর্তমান বাঁকুড়া জেলা দক্ষিন-পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত।[7]

ঔপনিবেশিক সময় পর্বে বাংলায় আগত আধুনিক বা পশ্চিমি জনস্বাস্থ্যের পরিকল্পনার কার্যক্রম গুলি কলকাতা এবং বিক্ষিপ্তভাবে কিছু শহরাঞ্চলের পৌরসভার কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রন মধ্যেই সীমবদ্ধ ছিল। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরকারী ভাবনার মধ্যে কখনই গ্রামীন স্বাস্থ্য ভাবনা খুব বেশী উল্লেখ যোগ্য স্থান লাভ করেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক সরকার আশা করেছিল ৯০% এর বেশি গ্রামীন জনগনের স্বাস্থ্য চেতনা ও পরিচ্ছন্নতার ধারনা তৈরী হবে শহরের পৌর অঞ্চলের আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা ধারার স্বাস্থ্য সম্মত সংস্পর্শের সাহায্যে, যা ছিল এক কথায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুযোগের ক্রমনিম্নতার নীতি। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষনে আন্তরিকতার পরিবর্তে, সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র এদেশে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও তার সৈন্যবাহিনীকে ভারতবর্ষের উষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার মধ্যে সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা।[8]

প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময় থেকেই বাঁকুড়া জেলা ছিল নানাবিধ অসুখের লীলাক্ষেত্র, কুষ্ঠ, যক্ষা, বিসূচিকা বা ওলাউঠা অর্থাৎ কলেরা, বসন্ত, জ্বর, উদরময়, আমাশয়, মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদি রোগের যথেষ্ট প্রকোপ ছিল বলে জানা যায়। রোগ নিরামের জন্য বিভিন্ন দেব- দেবীর কৃপার উপর নির্ভরশীল থাকত সাধারন মানুষ। তাছাড়া ওঝা বা গুনিনের ঝাড়ফোঁক, তেলপড়া, জলপড়া, নুনপড়ার সাহায্যে রোগ নিরাময়ের ওপর গ্রামাঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস ছিল ব্যাপক পরিমানে। পাশাপাশি রোগ নিরাময়ের জন্য সমাজের উচ্চবর্গীয় মানুষের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল আয়ুর্বেদ।[9] ঔপনিবেশিক বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ আগমনের সূত্র ধরেই পশ্চিমি চিকিৎসা ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে জেলায় ইয়োরোপীয় বা পশ্চিমী চিকিৎসার মূলধারা ছিল এ্যালোপাথি, মোটামুটি ভাবে বিংশ শতকের গোড়ার দশকে এ্যালোপাথির পাশাপাশি হোমিওপাথির প্রচলন হয়েছিল বাঁকুড়ায়। ১৮০৯ খ্রীঃ কাছাকাছি সময় হতেই বাঁকুড়া শহরে এ্যালোপাথি চিকিৎসার প্রচলন হয়েছিল, কারন ঐ সময়েই স্থাপিত হয়েছিল সিপাহী ব্যারাক হাসপাতাল।[10]

ঔপনিবেশিক কালে দারিদ্রের মত কুষ্ঠও ছিল বাঁকুড়ার মানুষের জনজীবনে একটি বড় অভিশাপ। বাঁকুড়া জেলার কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে আমাদের কাছে তথ্যসংগ্রহের প্রাথমিক সূত্র হল হান্টার সাহেবের স্ট্যাস্টিক্যাল এ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, বাঁকুড়ায় কুষ্ঠ, আমাশয়ের মতো একটি সাধারন রোগ।[11] ১৮৮১ ও ১৮৯১ খ্রীঃ জেলায় কুষ্ঠরোগ জনিত কারনে অঙ্গবৈকল্যের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮৭৭ এবং ৩৮৯৩, যা ছিল বাংলার অনান্য জায়গার তুলনাই অত্যন্ত বেশি। জেলার মধ্যে, গঙ্গাজলঘাটি ও বাঁকুড়া সদর থানা এলাকায় অঙ্গবৈকল্যের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী।[12] অন্ধত্ব, বধিরতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি জাতীয় অঙ্গবৈকল্য সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে দেখা গেলেও কুষ্ঠের কারনে বিকলাঙ্গের সংখ্যা ছিল বাউরী, মুসলমান ও আদিবাসী সহ অনান্য মজুর শ্রেণীর মধ্যে বেশী অথাৎ নিম্নবর্গের মানুষেরা এই রোগের শিকার হয়েছিল বেশী পরিমানে। সাধারন মানুষের বদ্ধমূল ধারনা ছিল কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে ও বংশানুক্রমিক, এবং স্বাস্থ্যহানিকর মাংস ভোক্ষন ছিল কুষ্ঠরোগের অন্যতম কারন।[13] তবে তৎকালীন জেলা শাসক এফ এইচ ব্যারোর মতে, এই জেলার কুষ্ঠরোগের অন্যতম প্রধান কারন ছিল টাটকা শাখ সব্জীর অভাব।[14] ১৯০৮ সালেও ওম্যালি সাহেব উল্লেখ করেছেন, বাঁকুড়ায় কুষ্ঠ একটি অতিসাধারন রোগ, তবে এই রোগের জন্য কি কারন ছিল তা তিনি সুনির্দিষ্ট করতে পারেন নি।[15] ১৯০৬ সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখা গিয়েছিল যে, ভারতবর্ষের অনান্য অংশের

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

তুলনায় বাঁকুড়া ও মানভূম (বর্তমানে পুরুলিয়া) জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ১৯১১ সালেও বাঁকুড়াকে কুষ্ঠরোগের জন্য ভারতবর্ষের সবচেয়ে কালো জায়গা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩১ ও ১৯৩৬ সালে জেলায় মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৪ হাজার ও ৪৫ হাজার। জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কোন ইউরোপিও ব্যাক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এমন খবর নেই। ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ এম্পায়ার লেপ্রসি রিলিফ এ্যাসোসিয়েসানের সমীক্ষা অনুসারে বাংলার সবচেয়ে কুষ্ঠরোগ অধ্যুষিত এলাকা ছিল বাঁকুড়া। এই জেলায় কুষ্ঠরোগ শুধুমাত্র যে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে বিরাজমান ছিল তা নয়, রাজপুত অথাৎ ছত্রীদের মধ্যেও এ রোগের প্রকোপ ছিল। ১৯১৭-২০ খ্রীঃ সময়কালে তৎকালীন জেলাশাসক জন. সি. ভাস উল্লেখ করেছেন, আর্থসামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ থাকলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও এই রোগের প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন বাঁকুড়া জেলার একাধিক জমিদার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন। যেমন, বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী অম্বিকানগরের প্রাক্তন জমিদার পরিবারের সন্তান রাইচরন ধবলদেব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন।[16] সরকারের কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত আইন থাকলেও বাঁকুড়ায় তা দৃঢ় ভাবে কার্যকারী ছিল না, আইন কাগজ কলামেই সীমাবদ্ধ ছিল, ফলে এদের কুষ্ঠাশ্রমে স্থায়িভাবে রাখা যেত না, যে কারনে তারা সর্বত্রই ভিক্ষাকরে বেড়াতেন, ফলত রোগের সংক্রমন বৃদ্ধি পেত।[17]

কুষ্ঠ হল ভীষন সংক্রামক ব্যাধি, আমাদের দেশে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য ব্রিটিশদের আগমনের অনেক আগে থেকেই চালমুগরার তেল ব্যবহৃত হত।[18] পাশাপাশি এই রোগের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাধারন মানুষ দেব দেবীর উপর নির্ভরশীল হতেন।[19] প্রাক ঔপনিবেশিক সময় থেকে, কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাঁকুড়ায় তথা রাঢ়বঙ্গে ধর্মঠাকুরের ব্যাপক প্রভাব ছিল।[20] পশ্চিমি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসারের ক্ষেত্রে ওয়েস্লিয়ান মিশনারীদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল। তারাই প্রথম জেলায় কুষ্ঠুরোগের চিকিৎসার জন্য ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিল 'ব্রায়ান কুষ্ঠাশ্রম' নামে একটি কুষ্ঠ হাসপাতাল। এই কুষ্ঠাশ্রম পরিচালনার দ্বায়িত্ব গ্রহন করেছিল 'মিশন টু লেপার্স'। রোগের চিকিৎসা দানকে হাতিয়ার করে মিশনারীরা দেশের মানুষকে ধর্মান্তকরনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছিল। কারন হিসাবে বলা যায়, ১৯০৭ খ্রীঃ কুষ্ঠাশ্রমে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৬, স্ত্রী রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৩ এবং শিশু ছিল ৭ জন। এদের প্রায় সবাই ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মালম্বী দেশীয় মানুষ।[21] ১৯২৭-২৮ সালে মিশনের উপদেষ্টা চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ কোচরেন। জেলার উচ্চবর্গীয় ও নিম্নবর্গীয় মানুষের সামাজিক ব্যবধানের প্রভাব পড়েছিল মিশনে আগত কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও। যে কারনে মিশনে উচ্চবর্ন ভুক্ত বা সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছিল। যদিও সেখানে আশানুরুপ রোগী হত না।[22]

কুষ্ঠরোগ নিবারনের ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও অনান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়। জেলাশাসক ভাসের অব্যবহিত পরবর্তী জেলাশাসক সতেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে ১৯২১ সালে জেলায় স্থাপিত হয়েছিল 'কুষ্ঠ নিবারনী সমিতি'। জেলাবোর্ড ও বাঁকুড়া পুরসভার সভাপতিদ্বয় ও অনান্য বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে তৈরী হয়েছিল এই সমিতি। ডাঃ ক্যালেব ডেভিস ছিলেন এই সমিতির সম্পাদক।[23] কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাঃ এল. মুইরও এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে যানা যায়। ১৯৩৫ খ্রীঃ ২০০ টিরও বেশি anti-leprosy ক্লিনিক খোলা হয়েছিল বাংলা প্রদেশে, তবে এর মধ্যে কয়টি

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

বাঁকুড়ায় স্থাপিত হয়েছিল জানা যায় না। যদিও তৎকালীন সময়ে একমাত্র বাঁকুড়া জেলাতেই এই ধরনের anti-leprosy ক্লিনিক পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড গুলির সহায়তায় ১৩৩ টি কুষ্ঠ নিরাময় মূলক সমিতি স্থাপিত হয়েছিল।[24] ১৯৩৪ সালে কুষ্ঠরোগ মোকাবিলায় বাঁকুড়া জেলাবোর্ডকে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন করে তুলেছিল, কারন এখানে কুষ্ঠোরোগীর হার ছিল ক্রমবর্দ্ধমান। ১৯৩৪ সালে বাঁকুড়ার সিভিল সার্জেন উল্লেখ করেছিলেন, এখানে অনান্য মহামারী ততটা মারাত্বক নয় যতটা কুষ্ঠ। তিনি আরও জানান বাঁকুড়ার মানুষ এই রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে উদাসীন ছিল কারন, এই রোগে মৃত্যুহার ছিল কম। যদিও এই রোগের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল সামাজিক গ্লানি বোধ।[25] যে কারনে কুষ্ঠরোগী, তার রোগটিকে সাধারন মানুষের থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।[26] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক কাল পর্বে কুষ্ঠরোগ ও কুষ্ঠরোগীর সামাজিক অবস্থানের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন।[27] জেলাবোর্ড প্রথম থেকেই কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধে সক্রিয় ছিল। এই রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের প্রধান অসুবিধা ছিল, সাধারন ডিসপেন্সারিতে অনান্য রোগের সাথে এই রোগের চিকিৎসা সম্পন্ন করা। জেলাবোর্ড, জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩০ টিরও বেশী অ্যান্টি লেপ্রসি ক্লিনিক গড়ে তুললেও অর্থনৈতিক অসলচ্ছতার কারনে, ক্লিনিক গুলিতে পর্যাপ্ত পরিমানে প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও ড্রেসার ছিল না। যার ফলে একজন চিকিৎসককে একাধিক অ্যান্টি লেপ্রসি ক্লিনিকের দ্বায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই রোগের চিকিৎসা কাঙ্খিত মানের দেওয়া যায়নি। পাশাপাশি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির সাংগঠনিক দূর্বলতাও ছিল যথেষ্ট। ডিসপেন্সারিতে অত্যধিক কাজের চাপের পাশাপাশি কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ও ড্রেসাররা বেতন বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছিল। যেমন ওন্দা ও সিমলাপাল। অথাৎ জেলায় কুষ্ঠরোগীর পরিমানের তুলনায়, চিকিৎসার পরিকাঠামো ছিল, পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত।[28] ব্রিটিশ এম্পায়ার লেপ্রসি রিলিফ এ্যাসোসিয়েশেনের, ইন্ডিয়ান কাউন্সিলের বেঙ্গল ব্রাঞ্চ ১৯৩৬ সালে বাঁকুড়ায় একটি লেপ্রসি ইনভেস্টিগেশন সেন্টার স্থাপন করেছিল। এদের কার্যকলাপ বাঁকুড়া সদর থানার অন্তর্গত জুনবেদিয়া ও আঁচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জেলায় কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রের জন্য এরা বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি, কেন্দ্রটির মূল উদ্দেশ্য ছিল কুষ্ঠরোগের মহামারী আকার গ্রহন সংক্রান্ত গবেষনা করা। পরবর্তী কালে ১৯৩৯ খ্রীঃ বাংলা সরকার, বি.ই.এল.আর.এ ও স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের যৌথ উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ডিসপেন্সারি পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল। ১৯৪০ সালে সরকার অনান্য সংস্থার সহযোগীতায় জেলাসদর ও মহকুমা স্তরে কুষ্ঠ হাসপাতাল স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছিল। এজন্য প্রতি বছর প্রাদেশিক সরকারের অনুদান নির্ধারন করা হয়েছিল, প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০০ টাকা এবং আবর্তিত ব্যয় নির্বাহের জন্য ১১৫ টাকা। জেলায় বিদ্যমান কুষ্ঠ চিকিৎসালয় গুলিকে এই পরিকল্পনার অধীনে আনা হয়েছিল। যদিও ১৯৪৪ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিগর্ভময় পরিস্থিতির কারনে এই পরিকল্পনার উন্নয়নের কাজ স্থগিদ করা হয়েছিল।[29]

সুতরাং বাঁকুড়া মতো একটি দারিদ্রক্লিষ্ঠ জেলায় ঔপনিবেশিক শাসনের প্রায় মধ্যবর্তী পর্ব হতেই শাসক সম্প্রদায়ের কাছে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত বেশীর ভাগ তথ্য অবগত থাকলেও এই রোগের প্রতিকার ও কুষ্ঠরোগীর সামাজিক গ্লানিকে দূরীভূত করার জন্য ঔপনিবেশিক সরকার বিশেষ কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। এই রোগে আক্রান্ত সিংহ ভাগ মানুষ ছিলেন দেশীয় সাধারন জনগন, ব্রিটিশদের মধ্যে এই রোগের আক্রান্তের সংখ্যা ছিলনা বলেই চলে, ফলত, কুষ্ঠ রোগ ও রোগী

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

নিয়ে শাসক গোষ্ঠীর কোন মাথাব্যাথা ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসন কালের শেষ পর্বে কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনাই ছিল অনেক কম। এক কথায় বলা যায় ঔপনিবেশিক বাঁকুড়া তথা বাংলায় ব্রিটিশ সরকার যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ ও পরিচালনা করেছিল তাতে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল উপেক্ষিত।

তথ্যসূত্রঃ

[1] Dr. Jahan Ali Purkait, *Recasting Unani Medicine in Aliah Madrasah(1780-1947),* Rupali, 1st, Kolkata, 2014, p.1.

[2] অরবিন্দ সামন্ত, রোগ রোগী রাষ্ট্র উনিশ শতকের বাংলা, প্রগ্রেসিভ, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ১৩।

[3] রথীন্দ্র মোহন চৌধূরী, Op.cit, পৃঃ ০২।

[4] West Bengal Forest Centenary Commemoration Volume, 1964, Forest Directorate, Govt. of W.B, p. 133.

[5] সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার অরন্যঃ অরন্যের বাঁকুড়া, সমাজ ও রাজনীতি, প্রগ্রেসিভ, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ৩১৭।

[6] W.W. Hunter, *The statistical Account of Bengal, Volume- IV*, Trubner & Co, London, 1876, p. 207.

[7] West Bengal Forest Centenary Commemoration Volume, Op.cit, p. 129.

[8] Kabita Ray, *History of Public Health in Colonial Bengal: 1921-1947,* K. P. Bagchi and Company, Calcutta, 1998, p. 14.

[9] রথীন্দ্র মোহন চৌধূরী, নয়া বাঁকুড়ার গোড়া পত্তন ও বিকাশ, পশ্চিম রাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া, ২০০৭, পৃঃ ১২০-২১।

[10] Ibid, p. 122-23.

[11] W.W. Hunter, *The Statistical Account of Bengal*, Volume-IV, p. 301.

[12] রথীন্দ্র মোহন চৌধূরী, নয়া বাঁকুড়ার গোড়া পত্তন ও বিকাশ, Op.cit, পৃঃ ১৩৫-৩৬।

[13] L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers Bankura*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1908, p. 83.

[14] রথীন্দ্র মোহন চৌধূরী, নয়া বাঁকুড়ার গোড়া পত্তন ও বিকাশ, Op.cit, পৃঃ ১৩৬।

[15] L. S. S. O'Malley, *Op.cit*, p. 83.

[16] রথীন্দ্র মোহন চৌধূরী, নয়া বাঁকুড়ার গোড়া পত্তন ও বিকাশ, Op.cit, পৃঃ ১৩৬-৩৭।

[17] প্রবাসী, ১৩৩০, শ্রাবন, ৪ র্থ সংখ্যা, ২৩ ভাগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৫৪।

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

[18] প্রবাসী, ১৩৩০, শ্রাবন, ৪ র্থ সংখ্যা, ২৩ ভাগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৭৫।

[19] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কুষ্ঠরোগীর বৌ, পতিতপাবন পাবলিশার, কলকাতা, ২০২১, পৃঃ ৫৮৬।

[20] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃ তৃতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ১৬৭।

[21] L. S. S. O'Malley, *Op.cit*, p. 84.

[22] রথীন্দ্র মোহন চৌধূরী, নয়া বাঁকুড়ার গোড়া পত্তন ও বিকাশ, Op.cit, পৃঃ ১৩৭।

[23] রামানুজ কর, বাঁকুড়া জেলার বিবরন, বাঁকুড়া, ১৯২৫, পৃঃ ৫৪।

[24] রথীন্দ্র মোহন চৌধূরী, নয়া বাঁকুড়ার গোড়া পত্তন ও বিকাশ, Op.cit, পৃঃ ১৩৮।

[25] আবীর লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপনিবেশিক বাঁকুড়ায় গ্রামীন স্বাস্থ্যঃ জেলাবোর্ডের ভূমিকা, সমাজ ও রাজনীতি, মুখ্য সম্পাদকঃ চন্ডীদাস মুখার্জ্জী, বাঁকুড়া, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬, পৃঃ ৩২।

[26] প্রবাসী, ১৩৩০, শ্রাবন, ৪ র্থ সংখ্যা, ২৩ ভাগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৫৩।

[27] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কুষ্ঠরোগীর বৌ, পতিতপাবন পাবলিশার, কলকাতা, ২০২১, পৃঃ ৫৭৬-৫৮৯।

[28] আবীর লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপনিবেশিক বাঁকুড়ায় গ্রামীন স্বাস্থ্যঃ জেলাবোর্ডের ভূমিকা, Op.cit, পৃঃ ৩২-৩৩।

[29] Kabita Ray, *Op.cit*, p. 90.